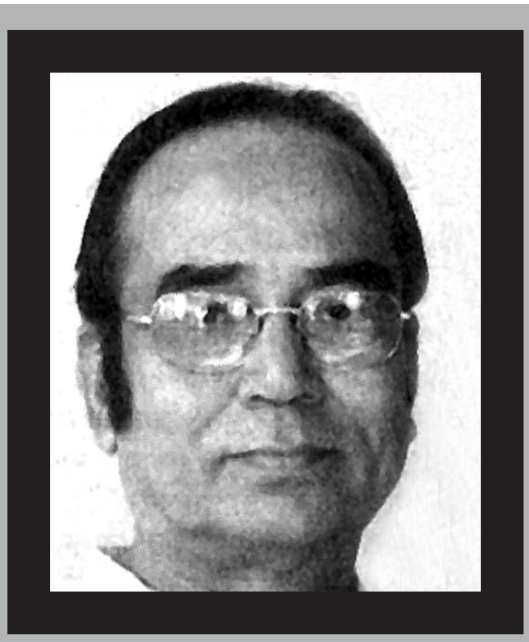

আমরা অভিভাবক হারালাম

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

তাঁর মৃত্যুর খবরটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। তারপরও মেনে নিতে মন সায় দেয় না। কারণ, আমরা যে আমাদের অভিভাবক হারালাম। তিনি আমাদের সবার মাথার ওপর প্রকান্ড বটবৃক্ষের ছায়ার মতো ছিলেন। ফলে কর্মক্ষেত্রে যেসব ঝড়-ঝাপটা এসেছে, সেসবের প্রায় কোনোটাই আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। যা সামলানোর, সবটাই তিনি সামলেছেন।আমি আমার সম্পাদক এনায়তেউল্লাহ খান ওরফে মিন্টু ভাইয়ের কথা বলছি। তাঁর সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক নিউ এজে আমি একেবারে শুরু থেকে কাজ করছি। নিউ এজে যোগদানের আগে থেকে সাপ্তাহিক হলিডেতে টুকটাক লিখেছি। মূলত এই হলিডে দিয়েই সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খানের পরিচয় ও সুনাম, তাঁকে নিয়ে সমালোচনা এবং বিতর্ক। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার এক অনন্য দিকপাল তিনি। আমার বলতে দ্বিধা নেই, এনায়েতউল্লাহ খানের সঙ্গে কাজ করব, বা তাঁর অধীনে কাজ করব, এরকম একটা ভাবনাই আমাকে নিউ এজে যোগ দিতে সাহস যুগিয়েছিল।

নতুন দৈনিক নিউ এজ প্রকাশ করার পরিকল্পনা যখন চলছে, তখন একদিন আলমের (বর্তমানে নিউ এজের উপ-সম্পাদক জায়েদ আলমের খান) আমাকে সাপ্তাহিক ২০০০ কার্যালয়ে বসেই পরিকল্পনার কথাটি জানান এবং এও বলেন যে, আমাকে তারা তাদের সঙ্গে প্রত্যাশা করেন। এরপর মূলত আলমের এবং কবীর ভাই (বর্তমানে নিউ এজের নির্বাহী সম্পাদক নুরুল কবীর) কয়েক দফা আলোচনায় বসে এক প্রকার সুহৃদসুলভ জবরদস্তি করায় আমার নিউ এজে যোগদানের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। একজন নবীন সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান দৈনিক প্রথম আলো ছাড়ার ঝুঁকি নেওয়ায় অনেকেই অবশ্য শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে সিদ্ধান্তটি সঠিক হচ্ছে না।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নিউ এজের ডামিপর্ব আরম্ভ হয়। ঐ সময়টা সময় একবার সিদ্ধান্ত হলো যে, কপি দেখার গতি বাড়ানোর জন্য সম্পাদকীয় বিভাগকেও সম্পৃক্ত করা হবে। প্রথম দিনই আমার একটি কপি নিয়ে দোতলায় হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। আমি নিচে দাঁড়িয়ে তানিম আহমদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ দোতলায় মিন্টু ভাইয়ের উচ্চ কণ্ঠ, 'এটা কে করেছে, কে করেছে?' আমি তানিমকে বললাম, 'কার জানি আজকে খবর আছে।' তানিম বলল, 'নিশ্চয়ই কপি কাইটা-ছিঁড়্যা ফেলছে, এখন খুঁজতেছে।'

কয়েক মিনিট পর পিয়ন এসে আমাকে বলল, 'খান সাহেব আপনারে ডাকছে।' আমি

> বিএনপিপন্থী বলে অভিহিত করা হলেও তাঁর কলম থেকেই তীব্র সমালোচনার যে লেখনী বেরিয়েছে, তা হজম করা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না। জামায়াত-শিবিরের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায়, বাংলা ভাই-জঙ্গিদের উত্থানে তিনি যারপরনাই বিচলিত ছিলেন যা প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কলামে। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে জামায়াতের অপতৎপরতা ও সরকারের নির্লিপ্ততা নিয়ে তিন পর্বে প্রকাশিত তাঁর ক্ষুরধার নিবন্ধটি এর সর্বশেষ প্রতিফলন

কাজের মধ্যে থাকার জন্য আমরা হলিডের জন্য এসাইনমেন্ট ও লেখালেখি করেছি। সম্পাদক মিন্টু ভাইর সঙ্গে সেই থেকে কাজ করা শুরু। নিউ এজ বের করার প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত তখন তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত উৎসাহিত ও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে কাজ করতে। ঐ

মনে মনে বললাম, 'গেছি'। দোতলায় উঠতেই মিন্টু ভাই একটি কপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা কি তোমার করা?' আমি ওটা দেখে বললাম, 'জি'।

'এটা তো আসলে এভাবে হবে', বলে তিনি কম্পোজ কপির ওপর কলম চালানো

কিছু অংশ দেখালেন। না, আমাকে তিনি ধমক দেননি। কোনোরকম ধমকের সুরেও কিছু বলেননি। বরং একটা স্নেহের পরশ ছিল তাঁর কথায়।

'আচ্ছা তুমি কম্পিউটারে ফাত্তাহর সঙ্গে বসো', বলে তিনি একটা কম্পিউটারের দিকে ইশারা করলেন। আমি বসে ফাইলটি খুললাম। পাশে বসা ফাত্তাহ ভাই। পেছনে দাঁড়িয়ে মিন্টু ভাই। উনি বলে যেতে থাকলেন, আমি ঠিক করতে থাকলাম। মাঝে মাঝে সহজ বানানও ভুল করছিলাম। কিন্তু কোনো বিরক্তিসূচক উক্তি শুনিনি। কাজ শেষ করার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রিন্ট আউট নিয়ে কি আপনাকে দেখাবো?'

'না না দরকার নেই, ওটা জামানকে (বার্তা সম্পাদক মীর আশফাকুজ্জামান) দিয়ে দাও।'

এই ছিলেন মিন্টু ভাই। আমাদের অনেকের ভুলে ভরা অশুদ্ধ ইংরেজি তিনি কোনোরকম বিরক্তি ছাড়াই ঠিক করেছেন। একের পর এক কপি দেখেছেন। কখনো বা ডেকে কোনো অংশ বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু ধমক দিয়েছেন বা দুর্ব্যবহার করেছেন, এমন ঘটনা বিরল। অথচ অন্য অনেক পত্রিকার কথা জানি, যেখানে সম্পাদকরা অনেক সময় কপি ছুঁড়ে ফেলে দেন, গালাগাল করেন।

২০০৩ সালের জুন মাসে নিউ এজ বাজারে এলো। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় মিন্টু ভাই অফিসে এসে বার্তাকক্ষে হাঁটাহাঁটি করতেন। কে কি লিখছে খোঁজ-খবর করতেন। কাজ ফাঁকি দিয়ে কেউ আড্ডা মারছে, কেউ বা কম্পিটারে গেম খেলছে, ওগুলো নিয়ে তিনি কখনোই মাথা ঘামাতেন না। বরং কখনো আমাদের বাণিজ্য বিভাগে এসে যদি দেখতেন, কোনো কপি দেখা বাকি আছে, নিজেই তা ঠিক করে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভঙ্গিমাটি ছিল লক্ষ্যণীয়। সিগারেট হাতে নিয়ে পেছনে দাঁড়াতেন। আর রিপোর্টারকে বসাতেন চেয়ারে। স্ক্রিনে চোখ রেখে বলে যেতেন। নিজে যখন কম্পিউটার ব্যবহার আরম্ভ করলেন, তখন থেকে অবশ্য আর কাউকেই ডাকতেন না।

সম্পাদকের দেয়া এসাইনমেন্ট ঠিকমতো না করা চাকরি খোয়া যাওয়ার সামিল। মিন্টু ভাই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। একবার একটি অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও বক্তা ছিলেন। ওটা কাভার করে অফিসে ফিরতে ফিরতে আমার প্রায় রাত ৮টা হয়ে যায়। তাই কোনোরকমে ছোট একটা রিপোর্ট লিখে জমা দেই। মিন্টু ভাই ৯টায় অফিসে এসে খোঁজ নিলেন কি অবস্থা। আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, 'দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই ছোট করে লিখেছি।'

'ও, লিখেছ। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে হলিডের জন্য একটু ডিটেল লিখব।'

মিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা স্বাভাবিকভাবেই কম হতো। তিনি না ডাকলে সাধারণত যাওয়া হতো না। তবে তার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। যে কোনো কাজে তার কাছে গিয়ে সহজেই কথা বলা যেতো।

২০০৩ সালের জুন মাসে নিউ এজ বাজারে এলো। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় মিন্টু ভাই অফিসে এসে বার্তাকক্ষে হাঁটাহাঁটি করতেন। কে কি লিখছে খোঁজ-খবর করতেন। কখনো আমাদের বাণিজ্য বিভাগে এসে যদি দেখতেন, কোনো কপি দেখা বাকি আছে, নিজেই তা ঠিক করে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভঙ্গিমাটি ছিল লক্ষ্যণীয়। সিগারেট হাতে নিয়ে পেছনে দাঁড়াতেন। আর রিপোর্টারকে বসাতেন চেয়ারে

নিউ এজ বের হওয়ার প্রাক্কালে প্রথম সভায় তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ঠিকভাবে না জানলে ভালোভাবে জেনে নিয়ে লিখতে। এজন্য যার কাছে প্রয়োজন তার কাছেই যেন জিজ্ঞাসা করে নিই এমন উপদেশই দিয়েছিলেন।

মাঝে-মধ্যেই নিউ এজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাপা হতো না। ফলে সব জায়গায় ঠিকমতো পৌঁছানো যেতো না পত্রিকা। সংবাদ সম্পাদনায় থেকে যেতো বড় ধরনের গলদ। এ কারণে মিন্টু ভাই চিন্তিত হয়ে উঠতেন। একবার তো নির্বাহী সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালককে একযোগে একটি চিঠি ইস্যু করলেন এসব দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। তিনি কী শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, যাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারছে না? বা করছে না? তিনি কী এরকম মনে করছিলেন যে, সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে উপেক্ষা করা হচ্ছে?

নিউ এজ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে প্রশংসা-সমালোচনা দুই-ই পেয়ে আসছে। সমালোচকদের একটা বড় অংশ রাজনেতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলে থাকেন। তাদের মূল বক্তব্য এরকম, এনায়েতউল্লাহ খান বিএনপিপন্থী, তার পত্রিকায় সরকারবিরোধী কোনো অবস্থান হবে না। আমি শতভাগ নিশ্চিত, যারা এ ধরনের সমালোচনা করেছেন, তারা প্রায় কেউই নিউ এজ ঠিকমতো দেখেননি, পড়া তো দূরে থাক। একবার এক আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা আর কি লিখবে সরকারের গুণকীর্তন ছাড়া?' আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি কি আমাদের পত্রিকা দেখেছেন বা পড়েছেন?' তাঁর জবাব ছিল, 'না ওভাবে দেখিনি, তবে জানি তো।' এ হলো আমাদের রাজনীতিবিদগণ। তাঁরা সবকিছু জানেন। আর তারা যেটা জানেন, সেটাই সঠিক, অন্যসব ভুল।

মিন্টু ভাই যে বিএনপির প্রতি দুর্বল ছিলেন, তার রাজনৈতিক মতাদর্শ যে বিএনপিপন্থী ছিল এটা সর্বজনজ্ঞাত। তাই বলে সরকারের সমালোচনা করা, সরকারের বিপক্ষে যায় এমন সংবাদ পরিবেশনে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তবে তিনি যেটা চাইতেন, সেটা হলো পেশাগত দিক যেন অক্ষুণ্ন থাকে। বিএনপিপন্থী বলে অভিহিত করা হলেও তাঁর কলম থেকেই তীব্র সমালোচনার যে লেখনী বেরিয়েছে, তা হজম করা বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না। জামায়াত-শিবিরের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায়, বাংলা ভাই-জঙ্গিদের উত্থানে তিনি যারপরনাই বিচলিত ছিলেন যা প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কলামে। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে জামায়াতের অপতৎপরতা ও সরকারের নির্লিপ্ততা নিয়ে তিন পর্বে প্রকাশিত তাঁর ক্ষুরধার নিবন্ধটি এর সর্বশেষ প্রতিফলন।

এনায়েতউল্লাহ খান আর নেই এটাই আজ কঠিন বাস্তবতা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত দীর্ঘদেহী সুদর্শন ব্যক্তিত্বটিকে আর কখনোই আমরা দেখতে পাব না সন্ধ্যাবেলা বার্তাকক্ষের ব্যস্ততম সময়ে আমাদের মাঝে পায়চারী করতে। আর কখনোই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন না, 'আচ্ছা, পিআরএজিএফ-এ আইএমএফ কী কী শর্ত দিয়েছে?' বা 'সিপিডির বাজেট রিয়াকশ্যান এসাইনমেনট তুমি করেছ? কপিটা একবার দেখিয়ে নিও।' কপি দেখতে দেখতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করবে না, 'বাংলাদেশ ব্যাংক এটা আসলে কাদের জন্য করছে?' মাথার ওপর থেকে নির্ভরতার ছায়াটা তো চিরতরে সরে গেল।